এইডস নির্মূলে প্রয়োজন জনগণের অংশগ্রহণ

সেলিনা আক্তার

সরকার প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) এইচআইভি/এইডস বিষয়ক লক্ষ্য অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ হতে এইডস রোগটি নির্মূল করার জন্য জাতিসংঘের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সরকারের পাশাপাশি আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা এইডস নির্মূল করতে সক্ষম হব।

বিশ্বের অন্যাঅন্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করে আসছে। বিশ্বব্যাপী ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা শুরু হয়। ঠিক তার পরের বছরে দেশে প্রথম এইচআইভি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো এইচ.আই.ভি ভাইরাসের সাথে লড়াই করে যারা বেঁচে আছেন তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এইডস আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন তাদের স্মরণ করার জন্য। মানবাধিকারের বিভাজন, বৈষম্য এবং উপেক্ষা এইচ.আই.ভি জয় করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এবারের ওয়ার্ল্ড এইডস দিবসের মূল থিম বা প্রতিপাদ্য বিষয়" পুটিং আওয়ারসেলভস্ টু দ্যা টেস্ট: আচিভিং ইকুয়ালিটি এন্ড ইন্ড এইচআইভি"। সহজ বাংলায় বলতে গেলে সবাইকে টেস্টের আওতায় আনতে হবে। সমতা অর্জন করে এইচ.আই.ভি শেষ বা নির্মূল করতে হবে। এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশ্বে প্রায় সাড়ে চার কোটির বেশি মানুষ এই নীরবঘাতক জীবাণু নিয়ে বেঁচে আছে। অথচ এর মধ্য এক কোটির বেশি মানুষ জানেই না তার শরীরে নীরব ঘাতক ভাইরাসটি রয়েছে।

এইডসের পুরো নাম অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম, যার অর্থ হচ্ছে দুর্বল শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা রোগী নিজেই অর্জন করেছে। এইডস রোগটির জীবাণুই হচ্ছে ভাইরাস। এই ভাইরাসের সংক্ষিপ্ত নাম এইচআইভি, যার পুরো নাম হলো হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস। এই ভাইরাস এক প্রকার জীবাণু, যা ব্যাকটেরিয়া থেকেও ছোটো এবং সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় না। প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বিশ্ববাসী এ রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত। কারও শরীরে এইচআইভি আছে কি না, তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। শুধু রক্ত পরীক্ষা করে এ ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এইডসের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ হওয়ার কত বছর পর এইডস হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কয়েক মাস কিংবা ১০-১৫ বছরের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের ১০ বছরের মধ্যেই এইডস হয়েছে। এই নীরব ঘাতকের জন্ম কোথায়, কীভাবে, তা নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলছে বিতর্ক। তবে গবেষণা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, পঞ্চাশের দশকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র কৃষক শ্রেণির মধ্যে প্রথম এ রোগ বিস্তার লাভ করে। এরপর ষাট ও সত্তরের দশকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু এইডসের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো গবেষকের মতে, মধ্য আফ্রিকার এক প্রকারের সবুজ বানরের দেহে সর্বপ্রথম এইডস বা এইচআইভি ভাইরাসের উপস্থিতি দেখা যায়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য অসমতা দূর করে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। অসাম্যের সমাপ্তি না ঘটাতে পারলে এইডস বা এইচ.আই.ভি শেষ বা নির্মূল করা যাবে না। এইচ.আই.ভি ভাইরাস একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়তে পারে রক্ত সঞ্চালন, এইচ.আই.ভি আক্রান্ত সুই এবং যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে। এছাড়াও এইচ.আই.ভি বহনকারী মহিলা থেকে গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালীন সময়ে তার সন্তানের নিকট এ ভাইরাস বিস্তার লাভ করতে পারে। এইডস তখনই হয় যখন এইচ.আই.ভি সংক্রমনের কারণে কারো রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এইডসের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। দেশ ও স্থানভেদে এইডসের লক্ষণের পার্থক্য দেখা যায়। এইডসের কিছু সাধারণ লক্ষণ যেমন অনেক দিন বা বারবার জ্বর হয়, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অতিরিক্ত অবসাদ, শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া, লিম্ফগ্রন্থি ফুলে ওঠা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, হাড়ের জয়েন্টগুলো ফুলে থাকা, ঘন ঘন বিভিন্ন রোগ যেমন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের প্রদাহআক্রান্ত হওয়া। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ডায়রিয়ার সমস্যা, যা স্বাভাবিক চিকিৎসায় কোনোক্রমেই ভালো হয় না, দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা কমে যাওয়া, তীব্র মাথাব্যথা ইত্যাদি ও অন্যান্য আরও কিছু লক্ষণ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে বিষয়টিকে নির্দেশ করে। তবে কারও মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে, এসব লক্ষণ দেখা দিলেই বিলম্ব না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অসচেতনতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, সুস্থ জীবনের অনুশীলন না করাটাই এ রোগের প্রধান ঝুঁকি। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে, তা হলো এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ অন্য কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে; আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত টুথব্রাশ, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ছুরি, ব্লেড বা ডাক্তারি কাঁচি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলে; আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে; এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে); অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌনমিলন করলে; সমকামী, বহুগামী ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক ও ভাসমান যৌনকর্মীর সঙ্গে অরক্ষিত যৌনমিলনের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ; এইচআইভি আক্রান্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিবিড় ভৌগোলিক অবস্থান, দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা এবং এভাবেই বিভিন্ন দেশে আসা-যাওয়ায় উপরোক্ত উপায়ে এইচআইভি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। শ্রমিক অভিবাসন ও মানব পাচারের ফলে এইডস আক্রান্ত জনগণের দেশে গমনাগমন এ রোগের ঝুঁকি বাড়ায়; সর্বোপরি এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা ও তথ্যের অভাবে রোগটি ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে।

এইচ.আই.ভি সংক্রমণ থেকে ক্যাপোসিস সারকোমা নামক ক্যান্সার হতে পারে। ক্যাপোসিস সারকোমা ত্বকে, মুখে, অন্ত্রে অথবা শ্বাসনালীতে হতে পারে। এইডস লিম্ফোমার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। লিম্ফোমা এক ধরনের ক্যান্সার যার সাথে শ্বেত রক্তকনিকা জড়িত। তার মানে এই নয় যে, মুখের এবং শরীরের লক্ষণসমূহ দেখা দিলেই কেউ এইচ.আই.ভি আক্রান্ত হয়েছে বা এইডস রোগ আছে এমনটি ভাবা মোটেও ঠিক নয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে দিতে পারে। এইচ.আই.ভি পরীক্ষার ফলাফল পজেটিভ হওয়ার অর্থ এই নয় যে এইডস রোগ হয়ে গেছে। এমন অনেক মানুষ দেখা গেছে যারা এইচ.আই.ভি পজেটিভ কিন্তু অনেক বছর তাদের কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। তাই এ ধরনের কোনো সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনেকের মধ্যে কিছু বিষয়ে বিভ্রান্তি থাকে এইডসের বিস্তার নিয়ে। তা হলো বায়ু, পানি, খাদ্য, মশা, মাছি বা পোকামাকড়ের কামড়ে; এইডস রোগীর ছোঁয়ায় বা স্পর্শে, হাঁচি, কাশি, থুথু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে, করমর্দন, একই ঘরে বসবাস, মেলামেশা, চলাফেরা ও খেলাধুলা করলে; আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পায়খানা, বাথরুম, বেসিন, থালাবাসন, গ্লাস, বিছানা, বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করলে এইচআইভি ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এইডস রোগীর চিকিৎসায় কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও ঝুঁকিমুক্ত। হাসপাতালে এইডস আক্রান্ত ভর্তি রোগীর আশপাশে অন্য রোগীদের ও এইডস ছড়ানোর ঝুঁকি নেই। বাংলাদেশে এইডস সংক্রমিত হয়েছেন ১৪ হাজার জন। এদেশে আক্রান্ত কম হলেও ঝুঁকি বেশি। পার্শ্ববর্তী দেশে ভারত ও মিয়ানমার এ রোগের উচ্চঝুঁকিতে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে মোট শনাক্ত রোগীর বড়ো একটি অংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর। সবকিছু বিবেচনায় এইচআইভির সংক্রমণ রুখতে দেশের বিমানবন্দর, নৌবন্দর ও স্থলবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রাণঘাতী এই রোগ প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারিভাবে যেমন উদ্যোগ নিতে হবে তেমনি নাগরিকদের মধ্যেই বাড়াতে হবে সচেতনতা। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার উচ্চঝুঁকির দেশ। তাদের সঙ্গে এদেশের ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের নানারকম যোগাযোগ আছে। তাই জনগোষ্ঠী সচেতন না হলে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশের ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ নারীই এইডস বিষয়ে অবগত নন। অবশ্য এইডসের অন্তত একটি বাহক সম্পর্কে অবগত ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ নারী। ৩৬ শতাংশ নারী সবগুলো বাহক সম্পর্কে অবগত। পাঁচ বছর আগে ২০১৬ সালে এ হার ছিল ২৯ শতাংশ। অর্থাৎ বাহক সম্পর্কে নারীদের মধ্যে সচেতনতার হার বেড়েছে ৭ শতাংশ। যদিও ৮-১০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল সরকারের সচেতনতা, বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হারে প্রবৃদ্ধি না হওয়ায় নারীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করে সরকারি সংস্থা বিবিএস। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল (এনএএসসি) প্রোগ্রামের তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ১২ লাখ ৯১ হাজার ৬৯ জনের এইচআইভি/এইডস শনাক্তকরণ পরীক্ষা হয়েছে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ লাখ ৩২ হাজার ৫৮৯। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে গত বছর নতুনভাবে এইচআইভি সংক্রমিত ৭২৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৪২০ জন, নারী ২১০ ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ১২ জন। গত এক বছরে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর ১৮৬ জন (২৬%), রোহিঙ্গা ১৮৮ জন (২৬%), বিদেশফেরত প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্য ১৪৪ জন (২০%), ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক গ্রহণকারী ৬১ জন (৮%), নারী যৌনকর্মী ১৭ জন (২%), সমকামী ৬৭ জন (৯%), পুরুষ যৌনকর্মী ৫৩ জন (৭%) ও ট্রান্সজেন্ডার ১৩ জন (২%) রয়েছেন। বিবিএস জরিপে উঠে এসেছে, দেশে ১৪ হাজারেরও বেশি এইডস রোগী শনাক্ত হয়েছেন। চিকিৎসার আওতায় এসেছেন ৮৪ শতাংশ।

বিশ্বব্যাপী আধুনিক ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভাবনের ফলে এইডসে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুহার অনেক কমে এসেছে। এখন সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে এইডস আক্রান্ত হলেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব। বাংলাদেশের জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এইডসে আক্রান্ত হওয়ার পর রোগীদের চিকিৎসাসেবার আওতায় নিয়ে আসার হার প্রতিবছর বাড়ছে। জাতিসংঘের চাহিদা অনুযায়ী, এইডস আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবায় নিয়ে আসার জন্য লক্ষ্য হচ্ছে অন্তত ৯৫ শতাংশে নিয়ে আসা। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইডস রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার। বাংলাদেশে সরকারিভাবে এইডসের চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। এইডস শনাক্ত করার জন্য সারাদেশে ২৭টি কেন্দ্র রয়েছে আর চিকিৎসাসেবা দেয়া হয় ১১টি কেন্দ্র থেকে। বাংলাদেশের সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী, যাদের শরীরে এইডস শনাক্ত হয়েছে, তাদের চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে পারছে। সংক্রমিতদের মধ্যে রয়েছেন নারী ও পুরুষ যৌনকর্মী, সমকামী, যক্ষ্মা আক্রান্ত ব্যক্তি, প্রবাসী শ্রমিক, হাসপাতালে প্রসব সেবা নিতে আসা মা ও রোহিঙ্গা। এইডসের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। বেশিরভাগ রোগী বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নেন। তবে তাদের নির্ধারিত কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ওষুধ সরবরাহ করতে হয় এবং চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। বড়দের ক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার ওষুধ আর শিশুদের জন্য সিরাপ দেয়া হয়ে থাকে। তবে কারও যদি এইডসের পাশাপাশি অন্য কোনো শারীরিক জটিলতা থাকে, তাহলে তার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেই রোগের চিকিৎসা নিতে হবে।

বাঁচতে হলে শুধু জানলেই হবে না, অন্যকে জানানোর মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে হবে। এইচ.আই.ভি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষার আওতায় সবাইকে আনতে হবে। অসমতা দূর করতে হবে এবং এইডস নির্মূল করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, স্বাস্থ্যখাতে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমার, আপনার, আমাদের সবার।

#

পিআইডি ফিচার